International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-III, November 2017, Page No. 1-9
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

মধুসূদনের নাটক : সংলাপ ও ভাষার এক নতুন ধারা

অনুসূয়া চক্রবর্ত্তী
অতিথি অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, সুকুমার সেনগুপ্ত মহাবিদ্যালয়, কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Michael Madhusudan Dutta is the real founder of Bengali drama with its realistic approach. Bengali drama had gone through so many hazzards and ups and down before him. Middle Age's 'Jatra' and the translation of western drama were not suitable enough in Bengali drama. So the bengali dramatists have used all the conventional patterns of Sanskrit drama. In this situation Madhusudan appeared in bengali drama with a new style and pattern of language.

In his first drama 'Sharmistha' he was not quiet able to come out from the effect of Sanskrit drama. So, all the characters from the common man, actress, fighters to the man like king, ministers are used the same lengthy, ornamented dialogues. There was no any dramatic conflict or contradition in the characters due to their imitative language. Madhusudan's next creation 'Padmabati' is anyhow better in its variety of language. He has followed the western pattern of using poetical language but the characters were more dramatic when they used the colloquial language. 'Krishnakumari' is the best one of his dramatic excellence. The style and pattern of language of the drama has a versatile effect.

Madhusudan's great work— his two Farce is full of varieties of language. In 'Akei ki Bale Sabhyata' he has used the language on different region, education, age, religion, profession and the language of woman in a realistic way. In 'Buro Saliker Ghare Row' he has used the dialect of Jasohar. It is incredible to use such language in that time when there was no existence of a solid and sustainable language of bengali drama and that is why Madhusudan is called the pioneer of bengali drama.

বাংলা নাটকের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপের প্রকাশ ঘটেছে মধুসূদন এর হাত ধরেই। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় সূত্রেই মধুসূদন বাংলা নাটকের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর আগে বাঙালীর নাট্য প্রচেষ্টা নানা ভাবনাচিন্তায় দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ পথ ধরেই এগিয়ে চলেছিল। মধ্যযুগীয় যাত্রাভিনয় থেকে পাশ্চাত্য প্রথায় মঞ্চাভিনয়ে আগ্রহী হওয়া অথচ পাশ্চাত্য মঞ্চাভিনয়ের উপযুক্ত বাংলা নাটকের অভাব, তাই সামনে বিস্তৃত সংস্কৃত নাট্যভাণ্ডারকেই তাঁরা ব্যবহার করেন - তারই ফলস্বরূপ আমরা পাই প্রথম বাংলা ভাষায় অভিনীত নাটক নন্দকুমার রায় এর 'অভিজ্ঞান

শকুন্তলম্' এর অনুবাদ। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ইংরেজি নাটকের অনুবাদও হয় যেমন 'ভানুমতী চিত্তবিলাস', 'চারুমুখ চিত্তহারা' ইত্যাদি। এরই সঙ্গে চলেছে মৌলিক বাংলা নাটক রচনার ক্ষীণ ও দুর্বল প্রয়াস। যেমন - তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন', যোগেশচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'। যদিও এগুলি মৌলিক রচনা তবুও সংস্কৃত নাট্যধারার প্রভাব থেকে এই নাটকগুলি বেরিয়ে আসতে পারেনি। সংস্কৃত নাটকের রীতি, ভাষাভঙ্গি, সংলাপ রচনা এই নাটকগুলির উপর প্রভাব ফেলেছিল। এই পটভূমিতে মধুসূদনের নাট্যকার রূপে আত্মপ্রকাশ। তাঁর নাটকের সংলাপে ভাষার বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার এক কালজয়ী সৃষ্টি। সংস্কৃত নাট্যরীতির বিরুদ্ধে বাংলা নাট্যজগতের দিক প্রদর্শনের প্রথম প্রাণপুরুষ তিনি। মধুসূদন এর মতে—

> *"নাটকে ব্যবহৃত সংলাপের সহিত সেই যুগের কথ্যভাষার সংযোগ থাকিবে। সেক্সপিয়ার তাঁহার যুগের সহিত সাদৃশ্য রক্ষা করিয়া ও সর্বকালীন আবেদন সৃষ্টি করিয়াছেন। নাটকে অনুকরণ চলে না। দৈনন্দিন জীবনের ভাষার পরিচয় নাটকীয় সংলাপে না পাইলে স্বভাবত দর্শকগণ হতাশ হইয়া পরিবেন।" [মধুসূদনের নাটক/ভবানীগোপাল সান্যাল, পৃ. ৬০]*

অবশ্য সংস্কৃতের আনুগত্য সজোরে অস্বীকার করলেও তিনি তাঁর নাটকে সংস্কৃত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেননি। তাঁর প্রথম দিকের নাটকগুলির সংলাপ আড়ষ্ঠ ও অত্যন্ত দীর্ঘ। সাধু ভাষার ব্যবহার তাঁর নাটকগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁর নাটকের আড়ষ্ঠতার একমাত্র কারণ শুধুমাত্র সাধুভাষার প্রয়োগই নয়, কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা ও অলংকারযুক্ত বাক্যের বিন্যাস। কাব্যের ক্ষেত্রে কবিত্ব মানায় কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তা বেমানান। সেজন্য তাঁর নাটকের সংলাপে সংস্কৃত নাটকের কাব্যময়তা এসেছে কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকের গতিময়তা আসেনি। এসব সত্ত্বেও তিনিই বাংলা নাটককে সংস্কৃতের আনুগত্য থেকে উদ্ধার করে আধুনিক ভাবে তাকে রূপদান করেছেন।

তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'তে তিনি সংস্কৃত প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বাংলা নাটক লিখতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত থেকে শব্দ, চিত্র, অলংকার প্রভৃতি নিয়ে এসেছেন। ভাষাকে চরিত্র ও ক্রিয়ার অধীনে না রেখে তাকে কবির মতো লাগামহীন ভাবে ব্যবহার করেছেন। তাই এই নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই অলংকৃত বাক্য ব্যবহার করেছে। একটি সাধারণ দৈত্য, পথচারী নাগরিক, সখী সকলেই সমাসবদ্ধ, দীর্ঘায়িত বাক্য ব্যবহার করেছে। চরিত্রগুলির ভাব প্রকাশে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হয় মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে তা অনুসরণ করেননি। সেজন্য নাটকটির ভাষা ও সংলাপ চরিত্র বিকাশের ও ঘটনার গতি নির্ধারণের বিপরীতধর্মী হয়েছে, সংলাপের মধ্য দিয়ে পরোক্ষ কাহিনির বর্ণনা হয়েছে মাত্র। যেমন নাগরিকের উক্তি—

> *"দেখুন বজ্রাঘাতে কোন বিশাল আশ্রয় তরুজ্বলে যায় তবে তার আশ্রিত লতাদির কি দুরবস্থা না ঘটে।" (২/১) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১৭১]*

এখানে একজন সাধারণ নাগরিক তৎসম শব্দবহুল সাধু ভাষায় কবিত্বপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে তার বক্তব্য বলেছে। এক্ষেত্রে তার শ্রেণি শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা সম্ভ্রান্ত কিনা বোঝার কোন উপায় নেই। ভাষার গুরুগম্ভীরতা ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে, আবার ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিচয়ই সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। এ ধরনেই চরিত্র তাই দর্শক পাঠকের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে না। ভাষা চরিত্রের সামাজিক অবস্থানকে সুস্পষ্ট করলে নাটকে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। যা এ নাটকে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রাজা, রাণী, মন্ত্রী, যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক ভাবে সমাজের উচ্চস্তরীয় হিসেবে পরিচিত কিন্তু তাদের সংলাপ এবং ভাষা অন্যান্য চরিত্রগুলির ভাষার সঙ্গে খুব বেশি পার্থক্যপূর্ণ নয়। যেমন—

রাজা- "আহা! কি মধুর স্বর। সুন্দরি! তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে আমার অন্তঃকরণ কি পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বলতে পারি না।" (২/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১৭৫]

মন্ত্রী- "(স্বগত) অদ্য অনন্ত দেবত আমার স্কন্ধেই ধরাভার অর্পন করে প্রস্থান কল্যেন।" (২/৩) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১৭৭]

এই সংলাপের পাশাপাশি একজন নটীর উক্তি—

"আমি মহারাজের আজ্ঞাবর্ত্তিনী।" (২/১) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১৭৫]

আবার এক দৈত্যের কণ্ঠে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

"কস্ত্বং" (১/২)_ [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১৬৩]

সেই সময়ের সামাজিক পরিস্থিতি কিন্তু এই ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সামাজিক বিভেদ বা প্রভেদের প্রমাণ সাহিত্যে আমরা পেয়েছি। সাধারণ নাগরিক, নাচ গান করে জীবিকা নির্বাহ করা নটী, একজন যোদ্ধা (এখানে যোদ্ধা বেশী দৈত্য), সখী এদের ভাষা, কথা বলার ধরণ রাজা-মন্ত্রী শ্রেণির সঙ্গে মিশে যাবে এটা সহজে গ্রহণ করা সেকাল বা একাল কোনকালের দর্শক ও পাঠকদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা আনে না। সে যতই পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনি অবলম্বনে নাটক রচিত হোক না কেন। তাহলে নাট্যকার কোন বিশেষ কারণে ভাষার এই সামঞ্জস্য বিধান করতে গেলেন। এখানেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় নাট্যকারকে। তৎকালীন শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক যাঁরা ছিলেন তাঁদের পছন্দ-অপছন্দের কারণ, নাকি দৈনন্দিনতার ধুলো মাটি ভরা জীবনের উর্ধ্বে কোন পরিশীলিত মার্জিত অমরাবতী সৃষ্টিই ছিল মাইকেলের মনের ইচ্ছা। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সেই কাজে তিনি সফল হলেও নাটক সৃষ্টির সম্ভাবনার ইতিহাসে তিনি উল্টো পথে হাঁটলেন।

এই নাটকের অন্যতম নারী চরিত্র দেবযানী তার পূর্বরাগের কথা যখন সখী পূর্ণিকার কাছে বলেছেন তখন আবেগ ও দুঃখের প্রকাশ যেখানে সংযত, সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন সেখানে তা বর্ণনামূলক হওয়ায় তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না। দেবযানীর উক্তি—

"প্রিয় সখি, সে চন্দ্রানন কি আমি আর এ জন্মে দর্শক করবো? (দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ) সেই অমৃতবর্ষিনী মধুর ভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে?" (১/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১৬৯]

কিন্তু এই দেবযানী চরিত্রকেই যথার্যথ নাটকীয় চরিত্র মনে হয়েছে যখন তিনি রাজাকে তিরস্কার করেছেন—

"যাও যাও। তুমি অতি নির্লজ্জ লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না। আমি কি শর্মিষ্ঠা? চন্ডালে চন্ডালে মিলন হওয়া উচিত বটে। আমি তোমার কে?" (৪/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১৯০]

এই ভাষা প্রকৃত নাট্যভাষার মতই ধারালো ও তীয়্ন। বিস্ময়, প্রশ্ন, তিরস্কার এইরূপ ভাববাচকতা দেবযানী চরিত্রের দ্বন্দ্বজটিল ও নিষ্ফল অভিমান মিশ্রিত মানসিক অবস্থা নাটকীয় ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। এই ভাষাই পাঠক-দর্শকের প্রাণের স্পর্শ লাভ করে। কিন্তু নাট্যকার সেখানে স্থায়িত্বের চেষ্টা করেননি।

উচ্চস্তরের নারী চরিত্রগুলিকে মাইকেল ভাষার আতিশয্যে মুড়ে দিলেও নটী চরিত্রের মধ্যে পরিচিত সমসাময়িক নারী ভাষার অল্প স্বাদ পাওয়া যায়। একান্ত নারী ভাষার যে বৈশিষ্ট্য যেমন 'গা' 'এমা', 'দূর হতভাগা' শব্দের ব্যবহার একমাত্র তার মুখেই শোনা গেছে। অপ্রধান, স্বল্পশিক্ষিত, অমার্জিত চরিত্র হলেও সে বিদূষকের চালাকিপূর্ণ কথার জন্য তাকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি। সে প্রশংসার ছলে তার ভুল কথার নিন্দা করে বলেছে—

"বাঃ ঠাকুরের কি সূক্ষ্মবুদ্ধি গা!" (২/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১৭৬]

মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে পুরাতন ও নবীনের মধ্যে যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন তা নাটক আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যায়। বাংলা গদ্য তখনও শৈশব পেরোয়নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে এই পরিস্থিতিতে ধ্রুপদী নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি এক স্বতন্ত্র ভাষা তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য—

> *"The only foult found with it, is that the language is a little too high for such audiences as we may expect now to patronize it." [মধুসূদনের নাটক, ভবানীগোপাল সান্যাল]*

অর্থাৎ এই ভাষা নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, দর্শকদের পক্ষে অবোধ্য। এই সমালোচনা নাট্যকারকে গৌরবান্বিত করলেও নাটকটিকে সফল করে না। তবে কোন কোন জায়গায় তিনি ভাবগত ও ভাষাগত সংগতি বিধানের চেষ্টা করেছেন তাই কিছু সময়ের জন্য হলেও দেবযানীর কণ্ঠে নারীর অভিমান, হাহাকার, নটী চরিত্রের মধ্যে মেয়েলি ভাষা লক্ষ্য করি। এককথায় সাহিত্যের বিচারে কিছু গভীবদ্ধতা থাকলেও 'শর্মিষ্ঠা' এক যুগোতীর্ণ সৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

তাঁর পরবর্তী নাটক 'পদ্মাবতী'। এই নাটকের ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব থাকলেও 'শর্মিষ্ঠা'র তুলনায় সরল ও কথ্য ভাষার ব্যবহার হয়েছে বেশি। সংলাপগুলি আকারে ছোট এবং বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে পাটকের কাছে বেশি উপভোগ্য হয়েছে। তবে এ নাটকে তিনি পাশ্চাত্য অনুকরণে পদ্য সংলাপ বেশি ব্যবহার করেছেন। শেক্সপিয়র বৈপরীত্য দেখানোর জন্য একই নাটকে গদ্য-পদ্যের ব্যবহার করেছেন। মধুসূদনও 'পদ্মাবতী'তে এই মতকে নাট্যভাষায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে পদ্য সংলাপ ব্যবহারের প্রকৃত মর্ম তিনি বুঝেছিলেন বলে মনে হয় না। শেক্সপিয়র প্রধান চরিত্রগুলির মুখে তীব্র ও গভীর ভাবাবেগ প্রকাশ করার জন্য পদ্য সংলাপের ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদন কঞ্চুকী ও কলির মুখে পদ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন। কঞ্চুকী কৌতুক রসাত্মক চরিত্র আর কলি নীচ প্রবৃত্তির ক্ষতিকারী চরিত্র। তাই বিসদৃশ চরিত্রের মুখে পদ্য সংলাপের ব্যবহারের জন্যই তা কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এই কঞ্চুকী, বিদূষক যখন সাধারণ ভাষা অর্থাৎ কথ্য ভাষায় কথা বলেছে তখন তা অনেকখানি প্রাণবন্ত হয়েছে। কঞ্চুকীর উক্তি—

"বেশ। ওলো মাধবি, লোকে বলে রৌদ্রে বৃষ্টি হলে খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি দেখচি তোরও বিয়ে অতি নিকটে" (১/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ২১৪]

আর বিদূষকের উক্তি—

"এ যে রাজা ইন্দ্রনীল! তা এখন কি করি? একে যে গালাগালি দিছি বোধ করি, মেরে হাড় ভেঙে দেবে এখন।" (১/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ২০৮]

বিদূষক, কঞ্চুকির কথাবার্তায় 'ওলো', 'লো', 'লো', 'ওগো' এ ধরনের শব্দ ব্যবহার চরিত্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। যদিও 'লা', 'লো', 'ওলো' মেয়েলী শব্দ কিন্তু নাট্যকার বিদূষক ও কঞ্চুকীর মুখে এই শব্দগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করেছেন। এদের মুখে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ভাঁড়ামি ভণিতায় পটু এ ধরনের চরিত্র রাজার পরিষদ হিসাবে রাজসভাগুলিতে উপস্থিত থাকত। নাট্যকার সেজন্যই এদের মুখে সাধারণ চলিত ভাষা ব্যবহার করে তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তুলেছেন।

রাজা ইন্দ্রনীলার সংলাপের ভাষা সাধুভাষা। তাঁর উচ্চ সামাজিক অবস্থানের কথা ভেবেই নাট্যকার এই ভাষা ব্যবহার করলেও 'শর্মিষ্ঠা'র তুলনায় এ ভাষার অনেকখানি সরলীকরণ করছেন।

'পদ্মাবতী'তে নারী চরিত্রগুলির ভাষা নারীসুলভ। মাইকেল এক্ষেত্রেও মূলত দুটি শ্রেণির নারীদের ভাষাগত পার্থক্য তুলে ধরেছেন। দেবী, পদ্মাবতী, তপস্বিনী, গৌতমী চরিত্রগুলি উচ্চমার্গের তাই তাদের ভাষা মূলতঃ সাধুভাষা তবে প্রয়োজনে তারা কথ্যভাষাও ব্যবহার করেছেন। এখানে নাট্যকার দেবী চরিত্রগুলিকে মানুষের মত করে উপস্থিত করেছেন। দেবদেবীদের ঝগড়া পর্বে তাদের মুখে 'বেহায়া', 'আই মা', 'কি লজ্জা', 'তোর মুখ দেখলে

পাপ' এ ধরনের মেয়েলী কথার ব্যবহারে আমরা ভুলে যাই যে স্বর্গের দেবীদের মধ্যে আছি কি না আমাদের সমাজেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি। দেবী রতির যখন কাঠুরেদের মেয়ের ছদ্মবেশ ধরেছেন তখন তার ভাষা—

"ওগো, তোমরা কারা গা? (৪/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ২২৯]

হ্যাঁগা তোমাদের কি এখানে থাকতে ভয় হয় না?" (৪/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ২২৯]

বেশ বদলের সাথে ভাষার বদলও যে জরুরি তা নাট্যকার ভুলে যাননি। সমাজে শ্রেণীগতভাবে ভাষার বৈচিত্র্য থাকবেই। এখানে সেই বিষয়টি ধরা পড়েছে। অপরদিকে বসুমতী, পরিচারিকা মাধবী, রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত, আবার জন্মগতভাবে সাধারণ সমাজভুক্ত। সেজন্য দুটি শ্রেণির সঙ্গেই তাদের যোগসূত্র রয়েছে। তাদের মুখের ভাষাও তাই প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। সাধু ভাষা ও কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন তাদের ভাষায়। উচ্চ-নীচ, সাধারণ-অসাধারণত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ না রেখে অবস্থার প্রয়োজনে ভাষার ব্যবহার করে মাইকেল নাটকটিকে মৌলিকতা দান করেছেন। সাধু-চলিত দুই ভাষারই সাবলীলতা, বৈচিত্র্য এবং জীবন্ত নারী চরিত্রের ভাষা নাটকটিকে একটি উৎকৃষ্ট নাটকে পরিণত করেছে।

মধুসূদনের নাট্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। এই নাটকটি তার ভাষা বৈচিত্র্যের উৎকর্ষতায় স্বমহিমায় উজ্জ্বল। নাটকের এখানে ভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। এখানে সংলাপের ভাষা চরিত্রের শ্রেণি ও প্রকৃতি অনুযায়ী সুসঙ্গত হয়েছে। নাটকীয় মুহূর্ত অনুযায়ী সংলাপের ভাষা ও ধরণ বদল করায় চরিত্রগুলির বহুমুখী আবেদন আমাদের কাছে সহজবোধ্য হয়েছে। নাটকের একটি প্রধান চরিত্র ভীমসিংহ চরিত্রটির স্বার্থকতার মূল কারণ নাটকীয় মুহূর্ত অনুযায়ী সংলাপের ব্যবহার। যখন তিনি রাজার ভূমিকায় তখন তার সংলাপ—

"ভগবিতী, এ ভারতভূমিকি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য কোনমতেই এ বিশ্বাস হয় না!..." (২/১) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ২৪৭]

রাজার অভিজাত সামাজিক অবস্থান এই সংলাপের ভাষায় প্রকাশিত। সমাজের উচ্চশিখরে অবস্থান করা এক ব্যক্তির ভাষা তৎসম শব্দবহুল এবং অলংকারযুক্ত হবে এ রীতি খুব একটা অস্বাভাবিক না। আবার তিনি যখন স্নেহাতুর পিতা তখন তার ভাষার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভাষার কোন পার্থক্য নেই।

"আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবী তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক তো। আহা! অনেক দিন হলো, মেয়েটাকে ভাল করে দেখি নাই।" (২/১) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ২৪৭]

সংলাপ এখানে চরিত্রের শুধু মুখের কথা নয় সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি।

স্বার্থপর প্রবৃত্তির দাস, ধনদাস তার সংলাপের ভাষায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেমন—

"মাছ ভায়া টোপটিত গিলেছেন।" (১/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ২৩৮]

"আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন।" (১/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ২৪৩]

এ ধরণের ভাষা সম্পূর্ণভাবে তার চরিত্রোপযোগী হয়েছে।

'কৃষকুমারী'তে নারী চরিত্রগুলিও তাদের ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্যময়। মাইকেলের সবগুলি নাটকের নারী চরিত্রই প্রাথমিকভাবে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলা বলে মনে হয়। এখানেও অন্যান্য নাটকের মত 'ওলো', 'ওগো', 'লো', 'মাথাখাও', 'পোড়ারমুখো' ইত্যাদি মেয়েলি শব্দ ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। নারীদের মধ্যে অভিজাত শ্রেণির নারীরা যেমন তপস্বিনী, রাজমহিষী, রাজকুমারীর ভাষা তাদের অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্ত হয়েছে। রাজকুমারীর কোমল মনের পরিচয় তার সংলাপে ফুটে উঠেছে—

"ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে প্রথমে চিনতে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতী, আপনি এ দাসীর দোষ মার্জ্জনা করুণ।" (২/১) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ২৪৮]

নারীত্বের সুললিত ছন্দ মধুসূদন করায়ত্ব করে তাকে নিপুণভাবে শিল্পায়িত করেছেন। তাইতো মেয়েদের আত্মসম্মানের চিরন্তন সত্যকে তিনি মদনিকার মুখে আবিষ্কার করেছেন—

"এ জন্মে কাকেও মেয়ে বলে অবহেলা করো না।" (৪/৩) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ২৭২]

নারী হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্য এত অবলীলায় তিনি চিত্রায়িত করতে পেরেছেন বলেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিন প্রাণপুরুষের মর্যাদা পেয়েছেন।

মধুসূদন তাঁর প্রহসনগুলিতে সংলাপের ভাষায় যে বর্ণময়তা এনেছেন তা অভূতপূর্ণ ও অবিস্মরণীয়। তাঁর সেই অপূর্ব ভাষা ব্যবহারের ধারা আজও অনুসৃত হয়ে চলেছে। নাটকের ক্ষেত্রে হয়তো কোন অদৃশ্যগণ্ডী বা বাধ্যবাধকতার জন্য তিনি ব্যবহারের তেমন উৎকর্ষতা দেখাতে পারেননি কিন্তু প্রহসন রচনায় তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহার করেছেন। প্রহসনের সামগ্রিক সাফল্যের হাতিয়ার হয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ বাস্তবিক অভিজ্ঞতালব্ধ সংলাপের ভাষা। 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) প্রহসনে তাঁর সৃষ্টি বর্ণময় চরিত্রমেলায় অঞ্চলভেদে মানুষের ভাষা, শিক্ষত-অশিক্ষিত শ্রেণির ভাষা, বয়সভিত্তিক ভাষা, ধার্মিক-অধার্মিকের ভাষা, পেশাভিত্তিক ভাষা, বারবিলাসিনীদের ভাষা, নারীদের ভাষা অকৃত্রিম ভাবে ফুটে উঠেছে।

শিক্ষিত সমাজের মূর্তিমান প্রতিনিধি নবকুমারের প্রকৃত মনোভাব তার সংলাপের বিজাতীয় ভাষাতে প্রকাশিত—

"ইন্ দি নেম্ অফ ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্জয় আওয়ারসেলভ্স।" (২/১) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৩৬]

ইয়ংবেঙ্গলদের এক যথার্থ প্রতিনিধি নবকুমারের ভণ্ডামিতে স্বেচ্ছাচার, অনাচার, অশালীনতারই প্রকাশ ঘটেছে। ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উজ্জ্বল দিকটি অবহেলিত হয়েছে। নবকুমারের এক অবিস্মরণীয় উক্তি—

"ও আমাকে মিত্যাবাদী বললে না কেন?... তাতে কোন শালা রাগতো? কিন্তু লাইয়র- একি বরদাস্ত হয়।" (২/১) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৩৬]

ইংরেজী ভাষার প্রতি কি অপূর্ব অনুরাগ। মানসিক দৈন্যতার এক চরম নিদর্শন এই সংলাপের কথা। বারবিলাসিনীদের নৃত্যগীতের প্রশংসায় তার উক্তি—

'কিয়া বাৎ জীতা রও।' (২/১) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৩৭]

'ছোড় দেও হামকো।' (২/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৩৯]

"ল্যাও - ব্রান্ডি ল্যাও - জলদি।" (২/১) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৩৯]

নাট্যকার নবকুমারের মুখে হিন্দি ভাষার ব্যবহার করেছেন। মূলত মদ্যপ অবস্থাতেই এই হিন্দি ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাবুসমাজের স্বভাব সঙ্গদোষ তাকেও যে প্রভাবিত করেছে তা বোঝা যায়।

অর্ধশিক্ষিত কালীনাথের কথাতে তার মোসাহেবী মানসিকতা ফুটে উঠেছে। ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে কথা বলে সে তৃপ্ত। 'আহা কি সফট হাত', 'টুরুথ বলব তার আর ফ্রেন্ড কি?'

কর্তা মহাশয় চরিত্রটি একটি ধার্মিক চরিত্র তাই তাঁর সংলাপের মধ্যে দেখা গেছে তৎসম শব্দবহুল সাধু ভাষা। যেমন—

"তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন।" (১/১) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩২৯]

অন্যদিকে বকধার্মিক বৈষ্ণব বাবাজী, মুখে তার রাধেকৃষ্ণ নাম কিন্তু অন্তরে ভোগবাসনা। রাস্তায় বারবিলাসিনীদের দেখে তাঁর উক্তি—

"আহাহা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখ্তে নিতান্ত কদাকার তা নয়।" (১/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৩০]

এ কথাতেই তার প্রকৃত ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। পেশাভিত্তিক ভাষা লক্ষ্য করা যায় সারজন, চৌকিদার, খানসামা, বেয়ারা এদের সকলের মধ্যে। সারজনের কথাবার্তায় তার পেশার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

"হ্যেং ইওর গ্যে, গ্যে, গে, চুপরাও ইউব্লাডি নিগর, ডেকলাও টোমারা ব্যেগমে কিয়া হেয়।" (১/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৩১]

ইংরেজ সারজনের যথোপযুক্ত ইংরেজী টানে বাংলা বলার চেষ্টা, ভারতীয়দের অপমান অসম্মান করা এবং তার কর্তব্য পরায়ণতার আড়ালে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা সবই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। চৌকিদার কর্মসূত্রে বাংলা

অঞ্চলে থাকলেও সে যে দেশের অন্য প্রদেশের লোক তা তার কথায় ভাষায় স্পষ্ট বোঝা যায়। বারবার তার মুখে 'ছাব' (সাহেব>সাব>ছাব) শব্দটি শোনা গেছে। বাবাজীকে তার নিজস্ব হিন্দি ভাষায় ও ঢঙে সে বলেছে—

'তোম্ হামকো তো কুচ দিয়া নেহি-আচ্ছা যাও, চলা যাও। (১/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৩২]

এই ভাষা চৌকিদারি পেশাগত মানুষের অবিকৃত ভাষা। দারোয়ান, বেয়ারা, খানসামা তাদের পেশাগত আনুগত্য পালন করেছে। সেজন্য তাদের কথায় 'যে আজ্ঞে', 'জী মহারাজ', 'আচ্ছা বাবা' এ ধরনের আনুগত্যপূর্ণ ভাষার প্রকাশ ঘটেছে।

বারবিলাসিনীদের মধ্যেও ভাষাগত তারতম্য দেখা যায়। নিচুস্তরের বারবিলাসিনীদের ভাষার কোন শালীনতা বা রাখ ঢাকের বালাই নাই। যেমন—

"ওলো বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখলি? আমার সঙ্গে যাচ্ছি বলে আবার কোথায় গেল?" (১/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৩০]

অন্যদিকে শহুরে পরিশীলিত মার্জিত কথা শোনা গেছে উঁচু স্তরের মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করা বারবিলাসিনীদের মধ্যে। পয়োধারী—

"আজকাল সদানন্দবাবু খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ দুটি পাওয়া ভার।" (১/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৩৩]

মেয়েলি ভাষা সৃষ্টিতে মধুসূদনের প্রতিভার স্বাক্ষর আমরা সর্বত্রই পেয়েছি। ভদ্রসমাজের অন্তঃপুরবাসিনীদের হাসি-ঠাট্টা, হেঁইয়ালী, আমোদ আহ্লাদ, গৃহস্থালির বিষয়, মেয়েলি ভাষার যাদু স্পর্শে যথার্থ নাটকীয় লাভ করেছে। 'মর ছুঁড়ি', 'খেলার ঈশ্বারায় বুঝতে পারিসনে', 'চুপ কর লো চুপ কর' এ ধরনের কথা নারীর নিজস্ব পরিচয়ের পরিপূরক হয়েছে।

মুখের ভাষা বা কথ্য ভাষার সম্পর্কে মধুসূদন যে সচেতন ছিলেন তা দুজন মুসলমান মোট বাহকের সংলাপের মধ্য থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু বাঙালী ও মুসলমান বাঙালীর ভাষার মধ্যেও যে একটা ব্যবধান আছে সে বিষয়টিও নাট্যকারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

দ্বিতীয় মুটে—

'দেখ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলো।' (১/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৩২]

মুটে যেহেতু মুসলমান সেহেতু সে আরবী, ফারসী মিশ্রিত বাংলা কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছে।

ইতিহাসের সূক্ষ্ম পরম্পরার হিসেব করলে উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা নির্ভর বাস্তবতা মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) থেকেই প্রধানত শুরু হয়েছে বলা যায়। যশোহর অঞ্চলের উপভাষার যথাযোগ্য ব্যবহার তিনি এখানে করেছেন। যে যুগে নাট্যসংলাপের ভাষা নিয়ে বাংলার নাট্যকারেরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারেননি, সেই যুগে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি যে উপভাষাকে নাটকের ভাষা রূপে প্রয়োগ করেছেন সেটা আমাদের কাছে এক বিশেষ প্রাপ্তি বলে মনে হয়। শুধু উপভাষা নয় চরিত্রের স্তর অনুযায়ী তিনি সেই উপভাষাকে সমাজ ভাষাতে পরিণত করেছেন।

হানিফ, ফতেমা এবং পুঁটি এই তিনজনের সংলাপই এই প্রহসনে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা এদের সংলাপকে দুটি দিক থেকে লক্ষ্য করতে পারি—

ক) নিছক একটি অঞ্চলের উপভাষা রূপে।

খ) সেই উপভাষাকে কতখানি নাট্যভাষা ও সমাজভাষায় নাট্যকার পরিণত করতে পেরেছেন সে দিক থেকে।

যে উপভাষা ব্যবহার সংলাপে দেখা যায় তার যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হল—

১) 'এ' এর উচ্চারণ 'এ্যা' ফেলতাম > ফ্যালতাম, ঠিকানা > ঠেকানা > ঠ্যাকনা, দেড়েকের > দ্যাড়েকের।

২) স্বরসঙ্গতি - কুম্পানি, নেত্য।
৩) মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণতা মোছলমান > মোচলমান।
৪) 'ন' ধ্বনি 'ল' তে পরিণত নিয়ে > লিয়ে।
রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—
১) অনুসর্গ, বিচে, মধ্যে
২) সর্বনাম - মোর > মুই।

এছাড়াও হানিফ ও ফতেমার সংলাপে কিছু আরবী ফারসী ও হিন্দি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আদমি, ওয়াকিফ, এনছাপ, ইয়াদ, ফোড়া, দোস্‌রা, নসিব, মেহেরবানী, লেকিন ইত্যাদি।

এবার দেখব এই উপভাষাকে চরিত্রের সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার কিভাবে নাট্যভাষাতে রূপ দিয়েছেন। হানিফের সহাস্য মন্তব্য—

"আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে,
তা জান্‌তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল?" (২/২) [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ৩৫৩]

এই ব্যঙ্গোক্তি ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্যকে যেন সরাসরি বিদ্ধ করে।

এছাড়াও সংস্কৃত পণ্ডিত বাচস্পতির ভাষা, ভক্তপ্রসাদের ভাষা পরিবেশ ও পরিস্থিতিগত ভাবে বেশ মানানসই হয়েছে। সামাজিক স্তর অনুযায়ী, আবেগের উত্থান-পতন অনুযায়ী তাঁদের ভাষার পরিবর্তন হয়েছে যা জীবন্ত ও উপভোগ্য হয়েছে।

নারী চরিত্র ফতেমা ছাড়া পুঁটির মধ্যেও ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়-
"থু থু! পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ীতে আসতে গা বমি বমি করে। থু, থু। কুঁকড়র পাখা, প্যাঁজের খোসা। থু, থু..." (১/২) [মধুসুদন রচনাবলী, পৃ। ৩৪৫]

শব্দের পুনরাবৃত্তি, অব্যয়পদের ব্যবহার, সহচর শব্দ, ধ্বনাত্মক শব্দ, বাক্যের পর্ববিভাগ (কুঁকড়র পাখা/প্যাঁজের খোসা) সব মিলিয়ে নারী ভাষা ও নাট্যভাষার সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটেছে। এক কথায় শুধু আঞ্চলিক ভাষাই নয়, চরিত্রের জাতি, শ্রেণী, প্রকৃতি ও মানসিকতা অনুযায়ী শব্দ ও বাকভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন নাট্যকার।

বাংলা নাটকে মধুসূদনের পূর্বে যেসব নাট্যকারেরা এসেছিলেন তাঁরা কেউই বাংলা নাট্যভাষাকে বাস্তবতার নিরিখে একটি স্থায়ী স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেননি। সেই যুগে দাঁড়িয়ে মধুসূদনের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি সেই স্থায়িত্বের সূচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং পরবর্তী নাট্যকারেরা সেই পরম্পরা অনুসারী হয়েছেন। মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'তে নাট্যভাষার যে জড়তা, সংস্কৃত আনুগত্যতা 'পদ্মাবতী' তে কিছুটা কাটিয়ে উঠার আপ্রাণ চেষ্টা দেখা গেছে। সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ 'কৃষ্ণকুমারী'র ভাষা নাট্যভাষা হিসাবে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত ও তীক্ষ্ণ চলিত ভাষা, আবেগের সংযত প্রকাশ, নারী হৃদয়ের রহস্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মধুসূদন ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে নাটকের তুলনায় প্রহসনগুলিতে নাট্যকারের ভাষাযোজনা এককথায় অনবদ্য-অসামান্য। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি হল আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা নির্ভর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি। তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে নাটকে তিনি যা করেননি প্রহসনে সেই অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছেন। চিরাচরিত ভাষার বেড়াজাল ছিন্ন করে চরিত্রগুলির মুখে তাদের নিজস্ব হৃদয়ের ভাষা, পরাণের ভাষা ব্যাহার করেছেন। শুধু প্রধান চরিত্রগুলিই নয়- সারজন, চৌকিদার, বেয়ারা, মুটে, পণ্ডিত এইসব গৌণ চরিত্রগুলিও তাদের সংলাপে ভাষা বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে তাদের মৌলিক ও নিজস্ব পরিচয় তৈরি করেছে যা আজও অনুসৃত হয়ে চলেছে। এখানেই মধুসূদনের অনন্যতা আর সেজন্যি তিনি বাংলা নাটকের পথপ্রদর্শক হিসাবে চিরবন্দিত।

তথ্যসূত্র:

১. মধুসূদনের নাটক- সম্পাদনা ভবানীগোপাল সান্যাল, বি বি ব্রাদার্স এণ্ড কোং., প্রকাশ ১৯৬৮।
২. মধুসূদন রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ)- আশোক বুক এজেন্সী,প্রথম প্রকাশ ২০০৩, নবম প্রকাশ ২০১৪।
৩. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাট্যবিচার- সাধনকুমার ভট্টাচার্য, বামা পুস্তকালয়, তৃতীয় সংস্করণ ২০০০।
৪. নাট্যমঞ্চ ও নাট্যরূপ (অখণ্ড সংস্করণ)- পবিত্র সরকার, দেজ প্রকাশনী, মার্চ ২০০০।
৫. বাংলা নাটকের ইতিহাস- অজিত কুমার ঘোষ, দেজ পাবলিশিং, দেজ এর প্রথম সংস্করণ ২০০৫।
৬. বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ- মনীন্দ্রলাল কুণ্ডু, সাহিত্য লোক, এপ্রিল ২০০০।
৭. ভাষা ও সমাজ-মৃণাল নাথ, নয়া উদ্যোগ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯।
৮. ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা- অনিমেষকান্তি পাল, প্রজ্ঞা বিকাশ, অক্টোবর ২০১২।
৯. মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী- সৌমিত্র বসু (সম্পাদিত) গ্রন্থবিকাশ, পুনমুদ্রণ-জানুয়ারি ২০১৬।
১০.নাট্যকার মধুসূদন ও কৃষ্ণকুমারী-অজিত কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, বামা পুস্তকালয়, পুনমুদ্রণ ২০১৫-১৬।
১১. মধুসূদনের একেই কি সভ্যতা- নিশীথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), গ্রন্থবিকাশ, পুর্নমুদ্রণ-জানুয়ারি ২০১৬।
১২. মধুসূদন দত্ত বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ- নির্মলেন্দু ভৌমিক (সম্পাদিত), শিলালিপি, পুর্নমুদ্রণ- নভেম্বর ২০১১।
১৩. The Bengali Drama- Its origin and Development; P. Guha Thakurata, Published 1930, Reprint in 2000 by Rout Udge.
১৪. The Development of the Drama (1960), Brander Mathew.